গ্রহান্তরের সুখ

কাজী জহিরুল ইসলাম

।।নয়।।

ম্যাঁ এ্যাঁ এ্যাঁ.....শব্দ করে টেলিফোন বেজে উঠলো।

ডিজিটাল টেলিফোন বাজছে। মনে হয় ছাগল ডাকছে। ডিজিটাল টেলিফোনের আবিস্কারক কি ছাগল পুষতেন? তিনিও বোধ হয় গান্ধীজীর মতো নিজের ছাগলের দুধ ছাড়া পান করতেন না। শায়লা কিছুটা বিরক্ত হয়।

এই দুপুরবেলা আবার কার শ্রাদ্ধ হলো। তুমি বসে বসে ডাল খাও, আমি দেখি।

না, একদম না। তুমি নড়বে না। ভাত রেখে একবার উঠেছো, আর উঠবে না। তুমি খাও, আমি বরং টেলিফোন ধরি। ডালের কাপ হাতে নিয়ে টেলিফোন ধরবো। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে যদি হাঁটাচলা করা যায়, তাহলে ডালের কাপ হাতে নিয়েও করা যাবে। একসময় এদেশের মানুষ চা খেতে জানতো না। ব্রিটিশরা বাজারে বাজারে গিয়ে মাগনা চা খাওয়াতো। এখন চা এদেশের প্রধান পানীয়, ৬৫ শতাংশ লোক চা পান করে। প্রতিদিন বাংলাদেশে কত কাপ চা খাওয়া হয় জানো?

শায়লা এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ে। মুগ্ধ হয়ে ওর কথা শুনে।

১৮ কোটি কাপ। বিরাট অপচয়। আমি চায়ের পরিবর্তে সমাজে ডালটাকে প্রতিষ্ঠীত করতে চাই। ডালের কেজি চব্বিশ টাকা আর চায়ের কেজি ১২০ টাকা। বিরাট অর্থের সাশ্রয় হবে।

শায়লা মনে মনে বলে, কচু হবে। এক কেজি পাতায় কত কাপ চা হয় তুমি জানো?

ফোন বাজা থেমে গেলো। শায়লার মেজাজ খারাপ হয়। মেজাজের কোনো দিগ পাশ নেই। ফোন বাজলেও খারাপ হয় আবার থেমে গেলেও খারাপ হয়। কোনো জরুরী ফোন হতে পারে। অজিতের ব্যাবসা বিষয়ক ফোন হলে ফোন না ধরার অপরাধে ওকে বকা শুনতে হবে। বকা খেয়ে শায়লা মন খারাপ করবে। মন খারাপ করে রাতে ভাত খাবে না। অজিত তখন ওকে ভাত খাওয়ানোর জন্য পেছন পেছন ঘুরবে। এক সময় ওদের প্রথম দেখা হওয়া টাঙ্গাইলের সেই জ্যোৎস্না রাতের গল্পটা বলবে। শরতের জ্যোৎস্না রাতে হঠাৎ চাঁদের ভেতর থেকে নেমে এলো এক ফুটফুটে ডানা কাটা পরী। নেমেই বললো, আমি চন্দ্রপরী। প্রতি পূর্ণিমা রাতে পৃথিবীর আকাশে উড়ে বেড়াই। দেখো না যুবক, আজ আমার ডানা ভেঙ্গে গেলো। তুমি আমার ডানাটা লাগিয়ে দেবে? খবরদার আমাকে ছোঁবে না কিন্তু, তাহলে আমি আর পরীর দেশে যেতে পারবো না। অজিত বলে, না ছুঁয়ে ডানা লাগাবো কি করে? চন্দ্রপরী তখন হি হি করে হাসে। কিছু একটা বুদ্ধি বের করো। আমিতো জানি মানুষের অনেক বুদ্ধি। অজিত তখন চন্দ্রপরীকে ছুঁয়ে দিয়ে বলে, তোমার আর পরীর দেশে যেতে হবে না।

এই গল্প শোনার পর শায়লার মন ভালো হয়ে যাবে, তারপর দু'জন একসঙ্গে ভাত খেতে যাবে।

অমিত যে ফোন ধরতে না গিয়ে ডালবক্তৃতা করলো, এটা ওর খারাপ লাগে না। মনে হয় দেবর ভাবীর যে চিরায়ত সম্পর্ক, ওদের সম্পর্কটা এতোদিনে ওইদিকে যাচ্ছে। তবে আজ ও অতিরিক্ত কথা বলছে।

পরিবারের কেউ হঠাৎ অতিরিক্ত কথা বললে শায়লার ভয় লাগে। দাদীর কথা মনে হয়। কেউ বেশী কথা বললে দাদী গলাটাকে চড়িয়ে বলতেন, 'অতি বকা নিদান ডাকা'। নিদানের অর্থ হলো দুঃখ।

আবার টেলিফোন বাজে। অমিত ডালের কাপে শেষ চুমুকটা দিতে দিতে ফোন ধরে।

হ্যালো।

অমিত ভাই, আমি ম্যানেজার হাশেম।

কি খবর হাশেম সাহেব?

খবর সামাইন্য খারাপ। স্যার হঠাৎ অজ্ঞেন হয়ে গেলেন। আমি সুহরাওয়ার্দি হাসপাতাল তেকে বলছি। ভাবীকে নিয়ে অতি তাড়াতাড়ি চলে আসেন। জুরুরী বিভাগে আছেন, ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে নেওয়া লাগতে পারে।

ডাক্তার কি বলেছে?

খুব আস্তে প্রশ্ন করে অমিত।

এ্যাঠাক। তিমুন গুরুতর না-ও হৈতে পারে। ঘাবড়াইবেন না। স্যারকে সাথে সাথেই হাসপাতালে আনা হয়েছে।

অমিত কোনো কথা বলতে পারছে না। ওর হাত থেকে রিসিভার পড়ে যাবার কথা কিন্তু যেন কিছুই হয় নি এমন ভঙ্গিতে ক্র্যাডলে রিসিভার নামিয়ে রাখে। তারপর খুব স্বাভাবিকভাবে হেঁটে ডায়নিং টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ায়।

শায়লা প্রশ্ন করে, কে?

ভাবী কাপড় বদলাবার কোনো দরকার নেই। এ অবস্থায়ই চলো, বাইরে যেতে হবে।

কোথায়?

অমিতের হঠাৎ এ রকম প্রস্তাবে ঘাবড়ে যায় শায়লা।

পরে বলছি। তুমি মাইশাকে বাড়িওয়ালাদের বাসায় রেখে আসো। একটু জলদি করো ভাবী।

তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। কে ফোন করলো? কোথায় যেতে হবে? তোমার ভাইয়ের কিছু হয়নিতো?

যা বলেছি তাই করো প্লিজ, কথা বাড়িওনা। সোহরাওয়ার্দিতে যেতে হবে।

শায়লা ছুটে যায় মাইশার কাছে। হাসপাতাল শব্দটা শুনেই ওর দু'চোখ ঝাপসা হয়ে আসে।

অজিতকে ইনটেনসিভ কেয়ারে রাখা হয়েছে। এখনো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। ওখানে কাউকে ঢুকতেও দেওয়া হচ্ছে না। শায়লা কান্না-কাটি করে চোখ ফুলিয়ে ফেলেছে। অজিতের কাছে যেতে চাচ্ছে। কিন্তু চাইলেইতো হবে না। অজিত শায়লার স্বামী হলেও এই মুহূর্তে ওর ওপর স্ত্রীর চেয়ে ডাক্তারদেরই অধিকার বেশী। এপ্রণ পরা একজন তরুণী ডাক্তার বেরিয়ে আসতেই সবাই তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো। ডাক্তার কিছু বলার আগেই সকলের কাছ থেকে বিক্ষিপ্ত প্রশ্ন ছুটে আসছে। বক্তব্য একটাই 'কি অবস্থা'। তিনি বেশ গম্ভীর গলায় গিজ্ঞেস করলেন, পেশেন্টের ক্লোজ রিলেটিভ কে? কোনো কথা না বলে শায়লা এগিয়ে গিয়ে ডাক্তারের সামনে দাঁড়ায়।

জ্ঞান ফিরেছে। তবে এখনো বিপদমুক্ত না। উনি কি আপনার স্বামী?

শায়লা ওপর-নিচ মাথা নাড়ে।

কোলেস্টরেল বেশ হাই ছিলো। তিনটা ব্লক আছে, বাইপাস করতে হবে।

অমিত দুই স্টেপ এগিয়ে শায়লার প্যারালাল দাঁড়ায়।

আপনারা ভেতরে যেতে পারেন। দয়া করে ওখানে গিয়ে কান্না-কাটি করবেন না।

হিল এবং ফ্লোরের মিউজিক তুলে তরুণী ডাক্তার চিরাচরিত গতিতে চলে গেলেন।

ভাবী তুমি যাও, আমি কেঁদে-টেঁদে ফেলতে পারি।

শায়লা কোনো কথা না বলে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে ঢুকে গেলো। আসলে অমিত চাচ্ছে শায়লা অন্তত কিছুটা সময় একান্তে তার স্বামীর কাছে থাকুক।

অতি আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে হার্টের মধ্যে তিনটা ব্লক নিয়ে অজিত স্বাভাবিকভাবে কথা বলছে।

ভয় পেয়েছো চন্দ্রপরী ? কিচ্ছু হবে না। আমি ঠিক ভালো হয়ে যাবো। আমার মেয়ে কোথায়?

ফাতেমাদের ঘরে রেখে এসেছি।

মেয়েটাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে।

শায়লা কান্না চাপা দিতে চেষ্টা করে। বলক দেওয়া দুধের হাঁড়ির ঢাকনা চেপে ধরলে যে শর্বনাশ হয়, তা-ই হলো শায়লার। ও শব্দ করে কেঁদে উঠলো। কিছুতেই আর কান্না সামলাতে পারছে না। ওর ভেতরে উথলে ওঠা এক সমুদ্রের ঢেউ। নার্স কটমট করে তাকালো শায়লার দিলে। শায়লার এখন কি করা উচিত? অজিত ওর ডান হাতটা শায়লার মাথায় তুলতে গিয়ে দেখলো সে হাত নাড়াতে পারছে না। আর তখনি এক রাজ্যের চিন্তা এসে ঢুকলো ওর মাথায়। মাত্র ব্যাবসাটা জমে উঠছিলো। অমিকেতো কিছুই বোঝানো হয় নি। ও কি পারবে সব সামলাতে? ঠিক তখনি সেই তরুণী ডাক্তারটি এসে ঢোকে।

আপনাকে একটু আসতে হবে আমার সাথে।

শায়লা সব কাগজপত্রে সই করে দিলো। অপারেশন হবে রাত আটটায়।

মোখলেছউদ্দীন তার মেয়েকে নিয়ে একরকম দৌড়াতে দৌড়াতেই হাসপাতালে এসে ঢুকলেন। অমিতকে দেখেই তিনি রেগে গেলেন।

এইটাতো বাবা ঠিক করো নাই। আমিতো ঘরেই ছিলাম। নামাজের বিছানায় ছিলাম। এমন একটা বিপদ, তোমরা আমাকে সঙ্গে না নিয়ে কি করে আসতে পারলে?

ফাতেমা ঠোঁট কামড়াচ্ছে। এর দুটো কারণ হতে পারে। হয় বাবার আচরণ ওর কাছে অস্বাভাবিক লাগছে। নয়তো কি বলবে, কি বলবে না, ভেবে ঠিক করতে পারছে না। খেই হারিয়ে ফেলেছে। অমিত ভাবছে এই ভদ্রলোকের কথার জবাব একটাই, স্ট্রেইট স্যরি বলে ফেলা।

চাচা ভুল হয়ে গেছে। ফোনে খবরটা পেয়েই আমরা চলে আসি। শুধু মাইশাকে দিতে আমি আপনাদের ফ্ল্যাটে গিয়েছিলাম। না হলেতো খবরটাই দেওয়া হতো না।

আমিওতো ফাতেমাকে সেই কথাই বলছিলাম। তা, অজিত বাবাজির অবস্থা এখন কি প্রকার?

আমিও দেখি নি। ডাক্তার জানালেন জ্ঞান ফিরেছে।

আলহামদুলিল্লাহ। মা জননী কোথায়?

কিছু কাগজপত্র সাইন করতে হবে, ভেতরে আছে।

কাগজপত্র সাইন করতে হবে কেনো? অপারেশন হবে নাকি?

জ্বি, বাইপাস করতে হবে। হার্টে ব্লক আছে।

এখনি করতে হবে?

ডাক্তার বললেন, তাড়াতাড়ি করে ফেলাই ভালো।

কোনো চিন্তা করবে না বাবা। আল্লাহ তা’আলা বিপদ আপদ দিয়ে মানুষকে পরীক্ষা করেন। সেই পরীক্ষায় যারা পাশ করে, তারাই প্রকৃত মানুষ।

জ্বি।

মা ফাতেমা। ওগুলো তোমার ভাইয়ার হাতে দাও।

বেশ কিছু ফলের প্যাকেট ফাতেমার হাতে। অনেকক্ষণ ধরে ওগুলো নিয়ে ও চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

চাচা কিছু মনে করবেন না। এ অবস্থায় ওগুলো রাখারতো কোনো জায়গা নেই। অপারেশন হয়ে গেলে যখন ভাইয়াকে কেবিনে নেওয়া হবে, তখন রাখা যাবে।

ঠিকইতো বলেছো বাবা। আমার বাবা মাথার ঠিক নাই। মা ফাতেমা, ওইগুলি তোমার কাছেই রাখো।

ফাতেমা সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেও অমিতের বেশ অস্বস্তি লাগছে। এই মেয়েটা কি তিন/চার কেজি ওজনের প্যাকেটগুলো হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে? কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে? সব ঠিকঠাক মতো হয়ে গেলে পেশেন্টকে কেবিনে নিয়ে যেতে এখনো পাঁচ/ছয় ঘন্টা বাকী। এক কাজ করলে হয় না, কেবিনটা আমরা আগে ভাগেই নিয়ে নিই।

'না নিয়ম নাই। হাসপাতালের কেবিনের মালিক হইলো গিয়া রুগী। রুগীর আগে অন্য কেউ ঢুকনের নিয়ম নাই। অপারেশনের আগে কেবিন পাওয়া যাবে না।'

এই কথাটা বলার পর মোখলেছউদ্দিন নিজের ওপর বেশ খুশি হন। মনে হয় তিনি একটা দার্শনিক কথা বলে ফেলেছেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন, গত কিছুদিন যাবৎ হঠাৎ হঠাৎ তিনি দার্শনিকের মতো কথা বলছেন। গত কয়েকদিন ধরে বেশ গরম পড়েছে। গতকাল বিকালের দিকে আকাশে খুব মেঘ করেছিলো। কালো কালো মেঘের মাথায় তামাটে মেঘের আবরণ। এইটা ঝড়ের লক্ষণ। হঠাৎ এক পশলা শীতল বাতাশ জানালা দিয়ে হুড়মুড় করে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে। সারাদিন মরুময় লু হাওয়ার পরে এই ঠান্ডা বাতাশটা ছিলো একটা বেহেশতের ফু। মোখলেছউদ্দিনের স্ত্রী হাজেরা বেগম প্রশান্তিতে চোখ বন্ধ করে বললেন, 'আহা, পরাণটা জুড়াইয়া গেলো'। আর মোখলেছউদ্দিন সঙ্গে সঙ্গে একটা দার্শনিক বক্তৃতা দিয়ে ফেললেন।

এখনি ঝড় হবে। শীতল বাতাশ তারই আলামত। ঝড় হইলে কি হয়? সব লন্ড-ভন্ড হয়। ঘর-বাড়ি ভাঙ্গে, গাছ-পালা ভাঙ্গে, গরু-বাছুর হারায়। মানুষের দুঃখ-কষ্ট বাড়ে। দুঃখের আগে আল্লাহপাক মানুষকে এক দন্ড শান্তি দেওয়ার জন্য বেহেশত হইতে এই শীতল বাতাশ পাঠান।

এই বক্তৃতাটা দেওয়ার পরও মোখলেছউদ্দিন নিজের ওপর বেশ খুশি হয়েছিলেন। তিনি কি ধীরে ধীরে দার্শনিক হয়ে যাচ্ছেন? তার বাপজান বলেছিলেন, মৃত্যুর দু'য়েক বছর আগে থেকে পরহেজগার মানুষেরা অতি মূল্যবান কথা বলতে শুরু করেন। আর পাপী বান্দারা বলে আবোল-তাবোল কথা। মোখলেছউদ্দিনের বাপজান মৃত্যুকালে বলেছিলেন, 'এই বছর ভালো ধান হবে'। সেইবার, যার এক কানি জমির চাষ, তার ঘরেও খোরাকির টান পড়ে নাই। আমিও কি বাপজানের মতো হয়ে যাচ্ছি? কথাটা ভেবেই মোখলেছউদ্দিন কেঁপে ওঠেন। মৃত্যুর জন্য তিনি এখনো প্রস্তুন হন নাই। এইবার ইনশাল্লাহ হজ্জ্বব্রত পালনের নিয়ত করেছেন, তার আগে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। বিবাহযোগ্য মেয়ে ঘরে রেখে পিতা হজে যেতে পারেন না। হজ কবুল হয় না।

মোখলেছউদ্দিনের কথা ঠিক হয় নাই। অজিতকে কেবিনে ট্রান্সফার করা হয়েছে। কেবিন নম্বর সাত, লাকি সেভেন। সাত নম্বর কেবিন পাওয়ায় সবাই খুব খুশি। একটু পরে যে অজিতের অপারেশন হবে, এইটা যেন এখন আর কোনো ঘটনাই না। মানুষ অতি দ্রুত সব কিছু মেনে নেয়। লাকি সেভেন একটা সাইকোলোজিক্যাল ব্যাপার। এই কেবিনের রোগি কি কখনো মারা যায় নাই? নিশ্চয়ই গিয়েছে। হোক সাইকোলোজিক্যাল ব্যাপার। কেবিন নম্বর সাত, এইটাকে কেন্দ্র করে যে ওরা এতো বড় একটা শোক সামলে উঠেছে এটাই একটা বড় ব্যাপার। এই সময়ে সাইকোলোজিক্যাল স্ট্রেংথটাই বেশী দরকার। এখন

সাড়ে সাতটা বাজে। আটটায় অপারেশন। অপারেশন সাতটায় হলে ভালো হত। লাকি সেভেনের বেনিফিট পাওয়া যেত। যাবতীয় প্রস্তুতি চলছে। ফাতেমা এখনো হাসপাতালে। মোখলেছউদ্দিন মাগরেবের আগেই চলে গেছেন। যাওয়ার সময় অমিতের ওপর ফাতেমার ভার দিয়ে গেছেন। 'বাবাজী, ওকে তোমাদের কাছে রেখে গেলাম। শায়লা মা জননী একলা আছে। ফাতেমা থাকলে সুবিধা হবে। তুমি ওকে বাসায় পৌছে দিও'। ম্যানেজার হাশেম বিস্তর খাটাখাটনি করছে। এতো দ্রুত কেবিন পাওয়াটাও হাশেমের কারিশমা। কারিশমা ছাড়া সরকারী হাসপাতালে কোনো কিছুই পাওয়া যায় না।

মোখলেছউদ্দিন আবার হাসপাতালে এসেছেন। এবার তিনি সঙ্গে তার স্ত্রী হাজেরা বেগমকে নিয়ে এসেছেন। হাজেরা বেগম ঠিকমতো হাঁটতে পারছেন না। আথরাইটিস বেড়েছে। কাজের মেয়ে সুহেলি একটা রূপার পানের বাটা হাতে নিয়ে তার পেছন পেছন ঘুরছে। তিনি বাইরে কোথাও গেলে এই রূপার পানের বাটাটি ব্যবহার করেন। এটি তার মায়ের হাতের চিহ্ন। তবে এখন তিনি কিছুটা সঙ্কিত। দামী ব্যাবহার্য হলো প্রদর্শনের জন্য। যেখানে একজন মানুষের জীবন নিয়ে যমে-মানুষে টানাটানি চলছে সেখানে মূল্যবান বস্তু প্রদর্শন ঠিক হচ্ছে কি-না তিনি বুঝতে পারছেন না। এটা নিয়ে তার খুব টেনশন হচ্ছে। টেনশনে তার কপাল ঘেমে যাচ্ছে। তিনি বিশেষ কোনো ইঙ্গিতময় ভাষায় সুহেলির দিকে তাকাতেই সুহেলি রূপার পানের বাটাটি তার দিকে বাড়িয়ে দিলো। হাজেরা বেগম দুটি সিঙ্গেল খিলি একসঙ্গে মুখে পুরে দিলেন। টেনশন বেড়ে গেলে তিনি ডবল খিলি ছাড়া খেতে পারেন না। হাজেরা বেগম বসেছেন এটেনডেন্টের বিছানায়, পাশেই শায়লা। ওরা বসেছে পেশেন্টের বিছানার দিকে মুখ করে। পেশেন্টের বিছানাটি পরিপাটি করে গোছানো। ধবধবে শাদা চাদর টানটান করে বিছানো। পাতলা একটি অতি নরম তুলার বালিশ। বালিশটিও দুধের মতো শাদা কভারে ঢাকা। এখন রাত সাড়ে আটটা বাজে। অপারেশন চলছে। শায়লা কোনো কথা বলতে পারছে না। ওর চোখ দিয়ে অনবরত পানি পড়ছে। হাজেরা বেগম বোবা মানুষের মতো নিঃশব্দে শায়লার মাথায় অবিরাম হাত বুলিয়ে যাচ্ছেন। শায়লার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে তিনি কেবিনের এদিক-সেদিক তাকাচ্ছেন। হাসপাতালের সব কিছু অতো ধবধবে শাদা হয় কেনো। সেভলনের কড়া গন্ধ সারা হাসপাতালের বাতাশে ভেসে বেড়াচ্ছে। শাদা রঙ আর সেভলনের গন্ধটা একসাথে মিশে কেমন একটা অপার্থিব ভীতিকর পরিবেশ তৈরী করেছে। হঠাৎ সেভলনের গন্ধটা যেন একটি নীরব মৃত্যুর গন্ধ হয়ে হাজেরা বেগমের নাকে লাগে। তার সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে। হাজেরা বেগমের কি আলোর মৃত্যুদিনটার কথা মনে পড়ে গেলো? তার ভেতরে একটা কান্নার স্রোত ক্রমশ হেঁচকির ঢেউ তুলছে।

মোখলেছউদ্দিন হাসপাতালের টানা বারান্দায় পায়চারী করছেন। তিনি আর টেনশনটা নিতে পারছেন না। তার অতিরিক্ত টেনশন হবার একটি বিশেষ কারণ আছে। তার কেবলি মনে হচ্ছে খারাপ কিছু ঘটে যাবে। আর কথাটা যতোবারই মনে হচ্ছে ততোই তার টেনশন বেড়ে যাচ্ছে। একটু দূরে সোডিয়াম বাতির নিচে অমিত আর ফাতেমা দাঁড়িয়ে আছে। তার আরেকটু দূরে ম্যানেজার হাশেম, একা। সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে দুটি শুভশব্দ শোনার জন্য। অপারেশন সাকসেসফুল। মোখলেছউদ্দিন হাঁটতে হাঁটতে অমিত ও ফাতেমার কাছে চলে এলেন।

মা, আমি তোমার আম্মিকে নিয়ে এখনি চলে যাবো। বেশী রাত হলে তোমার আম্মির আথরাইটিস বেসুমার বেড়ে যাবে। হাঁটাচলা বন্ধ হয়ে যাবে। তখন তাকে কোলে করে নিয়ে যেতে হবে।

ফাতেমা কিংবা অমিত কেউ কোনো কথা বলছে না। মোখলেছউদ্দিন কোনো উত্তরের অপেক্ষা না করে কেবিনের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন।

অপারেশন সাকসেসফুল হয়েছে। ওটি থেকে অজিত বেরিয়ে এলো রাত এগারোটায়। ফাতেমা তখনো হাসপাতালে। ডাক্তার জানিয়েছে অজিতের জ্ঞান ফিরবে ভোর রাতের দিকে। বেশ অনেকদিন হাসপাতালে থাকতে হবে। বাইপাস সার্জারী এই হাসপাতালে এর আগে আর মাত্র একটি হয়েছে। এটি সেকেন্ড কেইস। কর্তৃপক্ষের বিশেষ নজর রয়েছে পেশেন্টের প্রতি। সাকসেস স্টোরি লিখতে হবে।

মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। রাত এখন বারোটা। হাসপাতালের ভেতর রাত-দিন একই রকম। ওয়ার্ডগুলিতে রুগী, ডাক্তার, নার্স আর আত্মীয়স্বজনের উপস্থিতির একটা চাপা গুঞ্জন সারাক্ষণই জিইয়ে আছে। ২৪ ঘন্টাই রুগী আসছে, রুগী যাচ্ছে। দূর দূরান্ত থেকে আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব আসছে। হঠাৎ করে শায়লা যেন নিজের পা দুটির ওপর শক্ত করে দাঁড়ায়। ভেঙ্গে পড়লে চলবে না, এই আত্মোপলব্ধি ওর মধ্যে একটা আত্মবিশ্বাসের জন্ম দেয়। চট করে সে সমস্ত দায়-দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে এ পরিস্থিতিতে কার কি করণীয় সেই সিদ্ধান্ত দিতে শুরু করে।

হাশেম ভাই, আপনি একটা স্কুটার নিয়ে বাসায় চলে যান। কাল সকালে ঠিক সময়ে অফিসে যাবেন। অফিসে গিয়ে হাসপাতালে ফোন করে স্যারের খোঁজ নেবেন। টাকা-পয়সা লাগলে আমি আপনাকে জানাবো। চেক-ফেকে সই করতে হলে বলবেন, আমি সময় বলে দেবো, তখন আসবেন।

হাশেম আমতা আমতা করে, ঘাড় চুলকায়।

ভাবী, স্যারের জ্ঞেন না ফিরা পর্যুন্ত আমি থাকি?

না। আপনার রাত জাগবার কোনো দরকার নেই। আপনিও অসুস্থ হয়ে পড়লে ব্যাবসা দেখবে কে?

কথাটা বলেই শায়লা অমিতের দিকে তাকায়। ইঙ্গিতটা অমিত বুঝতে পারে। এতোদিন ও ভাইয়ের শ্বশুরের টাকায় দাঁড় করানো ব্যাবসায় ইনভল্ব হতে চায় নি। অজিতও ওকে টানে নি।

হাশেম ভাই আপনি আর দেরী করবেন না। এখনি চলে যান।

জ্বি অ। আসসেলামুওয়ালাইকুম।

অমি, তুমিও ফাতেমাকে নিয়ে চলে যাও। সাবধানে যেও। মাইশাকে সকালে নিয়ে এসো। তুমি তোমার অফিস থেকে দু'দিন ছুটি নাও। পারবেতো?

হ্যাঁ, পারবো।

ফাতেমা, তুমি এদিকে এসো। অমি, তুমি একটু বাইরে যাওতো।

শায়লা ফাতেমাকে বুঝিয়ে দেয় ওর জন্য কাল সকালে কি কি দরকারি জিনিস পাঠাতে হবে। এরপর ও ফাতেমার হাতে আলমারির চাবিটা তুলে দেয়। চাবিটা নিতে গিয়ে ফাতেমার হাত কেঁপে ওঠে। শায়লা ভাবছে বিপদের সময় সবাইকে কেমন আপন মনে হয়। কাউকেই অবিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। ফাতেমার মনে হয় ও যেন এ পরিবারেরই একজন। কোনোকালেও এ পরিবারের সাথে ওর কোনো আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিলো না এবং এখনো নেই, এটা যেন একটা শৈল্পিক মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই না। ও এ পরিবারেরই একজন। এ পরিবারের দুঃখ ওর নিজের দুঃখ। এ পরিবারের আনন্দ ওর নিজের আনন্দ। 'অপারেশন সাকসেসফুল' কথাটা শোনার সাথে সাথে ওর চোখ দিয়ে আনন্দে হরহর করে পানি এসে গেলো। এ অবস্থায় শায়লাকে একলা রেখে ওর বাসায় যেতে ইচ্ছে করছে না।

ভাবী আমিও থাকি তোমার সাথে?

কথাটা বলেই ও কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেলো। ও কি খুব অশোভন কিছু বলে ফেলেছে? এ বয়সের একটা অনাত্মীয় মেয়ে এরকম কিছু বলতে পারে না। ও-তো কাউকে খুশী করার জন্য এ কথা বলে নি। এ সময়েতো এটাই বলবার মতো অতি স্বাভাবিক কথা। তাহলে ওর এতো খারাপ

লাগছে কেনো? রক্তের সম্পর্কই কি তাহলে সব? হৃদয়ের সম্পর্কের কোনো মূল্য নেই? মূল্য হয়ত আছে কিন্তু কোনো জোর নেই। কোনো অথরিটি নেই।

সারা পথ ফাতেমা একটি কথাও বলে নি অমিতের সাথে।